তিন ঔপন্যাসিকের কলমে প্রান্তিক জীবন ও লোকসংস্কৃতি
(আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু : অভিজিৎ সেন, অনিল ঘড়াই ও নলিনী বেরা)

নুনম মুখোপাধ্যায়

উপন্যাস মানব জীবনের একটি ঘনিষ্ঠ প্রতিফলক। আমাদের ব্যবহারিক জীবন প্রতিনিয়ত উপন্যাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে ঘূর্ণায়মান। এর মধ্যে কিছু উপন্যাস আছে যেগুলি মাটির খুব কাছাকাছি অবস্থান করা মানব জীবনের কথা বলে। যে ধরনের ঔপন্যাসিকগণের রচনাশৈলী এই মাটি সংলগ্ন মানুষ, তাদের জীবন, জীবিকা, সংকট ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম অভিজিৎ সেন, অনিল ঘড়াই ও নলিনী বেরা। এই তিন ঔপন্যাসিকের নির্বাচিত উপন্যাসকে আলোচ্য হিসাবে গ্রহণ করে মূল প্রবন্ধে প্রবেশ করা যেতে পারে।

তিন স্বতন্ত্র ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির অনুসন্ধান একটি বিপুল শ্রমসাধ্য কাজ। ঔপন্যাসিক ত্রয়ীর দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-চেতনা, মানবিক মূল্যবোধ, দার্শনিক আদর্শ সম্পূর্ণই ভিন্ন। তবুও সমাজের অন্ত্যজ নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন-যুদ্ধ, বিপদ-সংকট, বেদনার যন্ত্রণা, আর্থিক টানাপোড়েন, প্রেম-পরিণয়, তাদের নিজস্ব সমাজের তৈরি গরলের পাঁকে ক্রমশ ডুবে যেতে থাকা মানুষেরা কোথাও যেন রক্তমাংসে আলাদা হয়েও মজ্জায় মজ্জায় মিলেমিশে একাকার। আলাদা করে চিনতে গেলে কোথাও যেন বাধো বাধো ঠেকে। যতটুকু তফাৎ তা শুধুই গঠনশৈলীর, কাহিনির ঠাস বুননের। কিন্তু উপন্যাসের মেরুদণ্ড কিংবা ভিতখানি সকলেরই এক।

ঠিক এই জায়গা থেকে শুরু করলে অন্ত্যজ জীবনের রূপরেখা যত স্পষ্ট রূপে টানা যায়, তত স্পষ্ট ভাবে লোকসংস্কৃতির উপাদান উঠে আসে না। আসলে ইদানীন্তন কালের বৃহত্তর সমাজের প্রতিটি তলার মানুষেরই জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে বহু লোকবিশ্বাস ও লোকাচার, সংস্কার। তাকে আলাদা করে দেগে দিতে চাইলে ভুল হয়ে যায়। কিন্তু লেখকের কলম স্বতন্ত্র। সেখানে ঘটনা স্রোতের প্রতি তরঙ্গে মিশে থাকে লোকবোধ, লোকআবেগ, লোকচেতনা। তাই যতটুকু লেখক দেখাতে চান, ততটুকুর নির্মেদ অনুসন্ধানই যথেষ্ট।

অভিজিৎ সেনের পেশা ব্যাঙ্কে চাকুরী। নেশা সাহিত্য। এহেন মানুষটি মূল ধারার সাহিত্য থেকে সরে এসে নিরন্তর প্রত্যক্ষ করে গেছেন সমাজের নীচুতলার মানুষদের। আত্মার আত্মীয়তায় অনুভব করেছেন তাদের দৈনন্দিন জীবনগাথা, প্রত্যক্ষ করেছেন আপাত অসম্ভব পরিণতিহীন সমাধানের প্রহসন। অভিজিৎ সেনের এমনই এক উপন্যাস 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' (১৯৯৫)। এই উপন্যাসে উঠে এসেছে নিম্নবর্গীয় জীবনাচরণের এক মেদুর গাথা।

সেখানে নিম্নবর্গীয় সমাজ, তাদের বিবাহ ও যৌনতার স্পষ্ট রূপরেখা এঁকেছেন লেখক। দুই নর-নারীর প্রেমকে কেন্দ্র করে অতীত ইতিহাসের বিষবাষ্প ঢেকে ফেলেছে চারপাশ। যার মাঝখান থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে নায়িকা বিদ্যাধরী ও তার প্রেমিক বালা লখিন্দর। যথারীতি নিম্নবর্গীয় বিশ্বাসের সমান্তরালে এসে মিশেছে লৌকিক দেব-দেবী, ভূত-প্রেত, ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-কবচ। বালা লখিন্দর তাঁতশিল্পীর ছেলে। দশটা তাঁত আছে তার বাবা রাজকিশোরের। তার মা মায়নোমতি বহু লোকায়ত আচার-বিচার, সংস্কার, লৌকিক দেবদেবীর পুজো, মানত ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে সন্তান ধারণের সুখ অর্জন করেছে। অপরদিকে বিদ্যাধরীর পিতা বিদেশি ছিল মালাকার। মাতা বকুলবালা। বিদ্যার বাবার কেচ্ছাকাহিনির অন্ত নেই। সে জাতচাষা কেদার ঘোষের বৌ সনেকাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। ফিরে এলে কেদার ঘোষ ও তার ভাইয়েরা প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করে বিদেশিকে। এ নিয়ে বহু পালাগান, যাত্রাপালা রচিত হয়েছে। বাঁশোরের পালিয়া রাজবংশিরা "সনেকাশোরী-বিদেশীবাউদিয়া" নামে খনের গান বেঁধেছে। মুর্শিদাবাদের জামাল রায়বেশিয়া "সনেকা-বিদেশী ডবল মার্ডার" নামে একটি পঞ্চরস আলকাপ পালা নামিয়েছে। সনেকা ও তার অনাগত সন্তানের মৃত্যু হয় বাজের শব্দে। বিদ্যাধরী দুই ট্রাক ড্রাইভার দ্বারা ধর্ষিতা হয়ে সন্তান সম্ভবা হয়ে পড়লে কবিরাজের কাছে পেট খসাতে নিয়ে আসে তার মা। কবিরাজ তার সন্তানের জন্য তাকে রেখে দিলেও সন্তানটি মারা যায়। সেই থেকে কবিরাজের বউ সেজে ছিল বিদ্যাধরী। কবিরাজের মৃত্যু হলে সে বালার সঙ্গে পালিয়ে বিয়ে করে। এ হেন কলঙ্কবতী মেয়ের প্রেমে বিবাগী ছেলের আচরণ সহ্য করতে পারেনি মা মায়নোমতি। এই কাহিনির সমগ্র অংশ জুড়ে রয়েছে অলৌকিক আবহ, যেখানে নিয়তি নির্ধারণ করে লোকজগৎ। মানুষ এখানে শুধুই নিয়তির হাতের পুতুল যেন। তাই বারবার শোনা যায় লোকগানের ওই বিশেষ ক-টি পঙ্‌ক্তি : "ভোলানাথ বিনে দুঃখ কৈনে হরে,/যারে তরায় শম্ভু সেই তরে"[১] কিংবা "ও বিধি বিড়ম্বিল হে—/কি ও দারুণ বিধি"।[২]

এছাড়াও এই উপন্যাসে বিস্তৃতাকারে উপস্থাপিত হয়েছে একটি বিশেষ লোকউৎসবকেন্দ্রিক লোকমেলা। যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে জাদু বাস্তবতা, তন্ত্রমন্ত্রের খেলা আর অজস্র কিংবদন্তি। মুসিধাপের মাহিষ্যদের পাড়ায় জ্যৈষ্ঠ মাসে বড়ো কালীপুজা হয়। তাতে বাণব্রত ও পাতাখেলার প্রতিযোগিতা হয়। এই বাণব্রত খেলাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কিংবদন্তি। মাতলা হাঁসদা ও কবিরাজ গুনমানের বাপ মাদারার প্রতিদ্বন্দ্বিতার গল্প। বাণব্রত খেলা এক প্রকার অলৌকিক প্রযুক্তির খেলা। মাদারার মন্ত্রপূত পাতার কোমরে দড়ি বেঁধে দুপাশ থেকে আটজন দশাসই মানুষ বেঁধে রেখেছে। কোনোভাবে ছেড়ে গেলেই পালক সুদ্ধ জীবন্ত হাঁস-মুরগী খেয়ে ফেলতে পারে সেই পাতা। এখন কোনও গুণমান যদি নিজের পোঁতা ত্রিশূল ও ত্রিশূলের গন্ডি আঁকা চাকলা থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে নিজের তৈরি পাতার আক্রমণে সে নিজেই মারা যাবে। এই খেলায় সুফল বাণ মেরে মাদারাকে হত্যা করতে চাইলে পাল্টা বাণে সুফলা মাদারাকে ঘায়েল করে। মুখে রক্ত উঠে সুফল মারা যায়।

উপন্যাসে নিয়তির নির্ধারক হিসেবে লৌকিক দেবতার অস্তিত্ব চোখে পড়ে। লৌকিক দেবী মাশ্‌না কালীর প্রভাবে এলুয়ার বাঁকে মাঝি, মাল্লা মানুষদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী মাশ্‌না হলো দেবতা এবং অপদেবতার মাঝামাঝি একপ্রকার বিশেষ

শক্তি। বলা ভালো উপদেবতা। এই কালমাশ্‌নার জন্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে বৈকুণ্ঠ বলেছে এলুয়ার দহ কালমাশ্‌নার জন্মস্থান। দহের জলে কালী স্নান করতে নামলে রূপমুগ্ধ ধর্ম এসে কালীর সঙ্গে মিলিত হয়। সেই কালী ও ধর্মের অবৈধ মিলনে জন্ম হয় মাশ্‌নার। এই মাশ্‌না অসম্ভব শক্তিশালী একজন যোদ্ধা। এর গায়ের রং কালোর ওপর সাদা ডোরা কাটা। এছাড়া পাকানো এক জোড়া গোঁফ দুপাশে ত্রিশূলের মতন খাড়া উঠে গেছে। হাতের এবং পায়ের পাতা উল্টোনো। এই তিসলি মাশ্‌নার বাহন গজাল মাছ।

উপরোক্ত কিংবদন্তি ছাড়া উপন্যাসের আনাচে কানাচে বারবার উঁকি দিয়েছে অজস্র লোকাচার, লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস। যার মধ্যে আছে—১. পুকুর ঘাটে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে নেই। ২. ফুঁ দিয়ে বাঁ হাতের বাতাসে কুপি নেভাতে নেই। ৩. বস্তার ওপর বসতে নেই। ৪. গাছের সব ফুল ফল পেড়ে নিতে নেই। অন্তত একটা রেখে দিতে হয়। ৫. সন্তানের স্তন্যপান করার বয়স অবধি বাইরে গেলে চুলে এবং কাপড়ের আঁচলে গিঁট বাঁধতে হয়। এবং বাইরে থেকে ফিরে শরীরের ওপর ঝাঁটা বুলিয়ে নিতে হয়। ৬. দুই স্তনের ওপর থুতু ছিটিয়ে তবেই সন্তানকে কোলে নিতে হয়। ৭. চুল ছেড়ে থাকতে নেই। চুল ভিজে থাকলেও নীচে অন্তত একটা গিঁট দিয়ে রাখতে হয়। ৮. বাসী কিংবা অশুচি কাপড়ে ঘরের বাইরে যেতে নেই। ৯. চুল আঁচড়ে ছেঁড়া চুল থুতু না দিয়ে ফেলতে নেই। ১০. থালাবাসন হাত থেকে পড়ে গেলে সেই সময়ে আর ওই বাসনে খেতে নেই। ১১. খাবার সময় হাঁচি হলে থালার নীচে একটু জল ফেলে তবে আবার খেতে হয়। ১২. দই, টক, চিঁড়ে, কচু, পালং শাক রাতে খেতে নেই ইত্যাদি ইত্যাদি।

'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' উপন্যাসে উপস্থিত আরও কিছু লোকসাংস্কৃতিক উপাদান সম্পর্কে বলে এই উপন্যাসের আলোচনা শেষ করা যেতে পারে। তার মধ্যে আছে লোকপেশা, যেমন—ধান শুকাতে দেওয়া, মালাকারের কাজ, শোলার কাজ, পটশিল্প, তাঁত শিল্প। এছাড়া উল্লেখিত হয়েছে লোকপ্রযুক্তি হিসাবে কাঁচির কথা কিংবা লোক অস্ত্র হিসেবে দা, হাঁসুয়া, কোঁচ ইত্যাদির কথা। অনিল ঘড়াইয়ের প্রতিটি উপন্যাসেই দেখা যায় দলিত-শোষিত-নিষ্পেষিত-অন্ত্যজ জীবনের কথকতা। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নুনবাড়ি' (২০১৬)-এর ব্যতিক্রম নয়। এই উপন্যাসে দেখা যায় স্বামী পরিত্যক্তা এক নারীর কঠিন জীবন সংগ্রাম। কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে যে গড়ে তোলে নুনবাড়ি। জীবনের প্রতি বাঁকে অসহায় যন্ত্রণার আবর্ত থেকে যে ছিটকে এসে বারবার মিশতে চায় মূলস্রোতে, গড়ে তুলতে চায় স্বতন্ত্র এক সমতাপূর্ণ সমাজ, এই উপন্যাস সেই লবঙ্গারই গল্প। লবঙ্গা মেদিনীপুরের নুনমারা সম্প্রদায়ের মেয়ে। অন্য নারী, মোটর গাড়ি ও সুখী জীবনের প্রলোভনে লবঙ্গার স্বামী তাকে ত্যাগ করেছে। তাই তার একমাত্র সন্তান নোনাই এর হাত ধরে সে ফিরে এসেছে পঙ্গু বাবা জটায়ুর কাছে। জীবন ধারণের প্রয়োজনে কখনও মাঠে গোবর কুড়িয়েছে, ঘষি দিয়েছে। কখনও মুড়ি ভেজেছে, চিঁড়ে কুটেছে, ধান ঝাড়াইয়ের কাজ করেছে। এগুলি সবই লোক পেশার অন্তর্ভুক্ত। এই সূত্রে গ্রামের পুরুষদের পেশার মধ্যে লক্ষ করা যায় খেয়া নৌকা বাওয়া, কবিয়াল হয়ে গ্রামের কেচ্ছা-কাহিনি নিয়ে পালা বেঁধে গান গাওয়া, এছাড়া যাত্রাদলে ফুলোট বাঁশি বাজানো প্রভৃতি।

লবঙ্গা শেষ পর্যন্ত পেটের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ব্যভিচারী বাল্যসখীর পরামর্শে কাজ হিসাবে বেছে নিয়েছে জাতপেশা নুনমারাকেই। এককথায় নোনাখাল থেকে নোনা জল ধরে এনে ফুটিয়ে নুন তৈরি করাকেই বলে নুনমারা। এই পেশাটিকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করতে গিয়ে লবঙ্গা মেনে চলেছে বহু লোকাচার ও লোকসংস্কার। লবঙ্গা'র নুনবাড়ি তৈরির বাসনায় শঙ্কিত পঙ্গু জটায়ুর মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে লোকবিশ্বাসের কথা—"নুনবাড়ি যেন তোর মরণ-বাড়ি না হয়! নুনবাড়িতে ঘোঘা হলে সেই ঘোঘা বুকেও বাসা বাঁধে।"[৩] আবার লোকসংস্কার অনুযায়ী—"মাসের ওই কটা দিন অবলা বলছে, নুনবাড়ি ছোঁয়া নিষেধ। তাহলে নাকি নুন দানা হয় না। নোনটা ভাবতা উবে পানসে হয়ে যায় নুন।"[৪] আবার নুনবাড়ি সবার সহ্যও হয় না। যেমন জটায়ুর বাড়িতেও নোনাজল ফুটলে কোনও না কোনও সর্বনাশ হয়।

নুনবাড়ি তৈরির প্রথম কাজ চরদাগানো। জোয়ারের ফলে খালের জল চর চাতাল জুড়ে ফেলে রেখে যায় নুন মাটি, তার মধ্যে থেকে খুঁজে নিতে হয় নামলা চর। কারণ নামলা চরে জল দাঁড়ায় বেশি, ফলে পলিও বেশি জমে। এই মাটিতে কচার ডাল, বাঁশের ডগাল, কঞ্চি, পাকাটি কিংবা ঢোল কলমির ডাল দিয়ে দশ বিশ হাত জায়গা বর্গাকারে পুঁতে জায়গার দখল নিতে হয়। আবার কেউ খুঁটি চারটের এমাথা-ওমাথায় বেঁধে রাখে শন দড়ি। তিন দিন চড়া রোদ পেলেই নুনমাটি শুকিয়ে যায়।

এই মাটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নুন চেনার পেশা। গ্রামের নরহরি বুড়ো খালের জল একবার হাতে নিয়েই বলে দিতে পারে তাতে কতটা নুন, আর কতটা কাদা, বালি। জটায়ু লবঙ্গাকে শেখায় নুনমাটি চেনার পদ্ধতি। নুনমাটি পা দিয়ে ঘষলে যখন গোড়ালি চড়চড় করবে আর পায়ে বিঁধবে গুঁড়ো গুঁড়ো কাঁচের মতো নুনের ধার, তখন বুঝতে হবে মাটি তৈরি। এই নুনমাটি থেকে নুন তৈরি এই সবকিছুর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে বেশ কিছু লোকযন্ত্র। যেমন টিনের চুঁছনি, ঝুড়ি-ঝোড়া, বাঁক ঝুড়ি, বাঁশের বাতা, কোদাল, শাবল, বাঁশের সরু পাঁপ বা চোঙ। লোক তৈজস জামবাটিতে, লোকখাদ্য ভিজে ভাত তাদের দৈনন্দিন আহার।

নুনবাড়ির কাজ লবঙ্গা তার মৃত মায়ের নাম নিয়ে বৃহস্পতিবার শুরু করেছে। কঞ্চিবেড়ার বাগানের ভেতর নির্দিষ্ট জায়গাটিকে গোবর জল দিয়ে পরিষ্কার করে মুছেছে। মাথায় করে বয়ে আনা নুনমাটিগুলো এখানেই শুকনো তালপাতা ও আউড় চাপা দিয়ে রেখেছে। নুন তৈরির সঠিক সময় ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাস। এই সময় রোদের তেজ কড়া থাকে। বর্ষা এসে গেলে নুনবাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। নুনবাড়িতে পাশাপাশি দুটি গর্ত খোঁড়া হয়। একটি আকারে অপরটির দ্বিগুণ। একটি গর্তে মাটি ঢালা হয়। সেই গর্তের নীচে লাগানো থাকে পাঁপ। যে পাঁপ দিয়ে নুন জল চুঁইয়ে নামে অন্য গর্তে বসানো কলসিতে। নুনবাড়ির দশ হাত দূরে মাটি খুঁড়ে তৈরি করা হয় নুনবাণ। এটিতে নুনজল জ্বাল দেওয়া হয়। এই কাজগুলির জন্য প্রয়োজন চারহাত লম্বা, দু হাত চওড়া চ্যাতড়া কড়াই, গাদ তোলার গহীরা হাতা আর চাটু। এগুলি প্রতিটিই লোক তৈজসের অন্তর্ভুক্ত সামগ্রী।

নুনবাড়ির শ্রমিক এই সহজ পদ্ধতিটিকে কখনই এত সহজ ভাবে দেখে না। কারণ তার ভাবনা চিন্তায় মিশে থাকে বিশ্বাস, সংস্কার। "নুনবাড়িতে মাটি ঢালা হবে আজ। শুদ্ধ শরীরে

এসব কাজ করলে নুনবাড়ির আয়ু বাড়ে।"[৫] তাই লবঙ্গ ধোয়া কাপড় পরে। প্রথম জল ঢালার জন্য পবিত্র শরীর মনের প্রয়োজন তাই, নোনাইকেই নির্বাচন করা হয়। সমস্ত শুদ্ধাচার না মানলে নুনবাড়ির বড়ো শত্রু ঘোঘার আবির্ভাব ঘটে। ঘোঘা হলে নুনজলে ঘূর্ণি সৃষ্টি হয়। মাটিতে ধ্বস নেমে অন্য গর্তের কলসি ভরে যায়। এতে নুন নষ্ট হয়। তাই ঘোঘা হলে নুনমাটি দিয়ে ঘোঘার পথ আটকাতে হয়। সব শেষে কলসিতে ধরা নুনজল জ্বাল দিতে হয়—

> গরম নুনে রসাল ভাব থাকে। নুনের জলশোষণ ক্ষমতা বেশি। কড়াইয়ের নুনগুলো চেঁছে কাপড়ে বেঁধে সেই পোঁটলাটা ছাই গাদায় বসিয়ে এসেছিল সে। ছাই তাড়াতাড়ি রস চোষে। সব রস নিংড়ে মুহূর্তে খড়খড়ে করে দেয় নুন।[৬]

নুনবাড়ি তৈরির কাহিনি, লবঙ্গের জীবন সংগ্রাম, নুনের মাহাত্ম্য কথা কখন যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আর এর ফাঁকে ফাঁকে উঠে এসেছে চলতি কিছু প্রবাদ। যারে দেখতে নারী তার চলন বাঁকা, বেলে মাটিতে দুর্গা প্রতিমা হয় না, গাই বাছুরে মিল থাকলে জঙ্গলে গিয়েও দুধ দেয়, পাঁকে পা দিলে গায়ে তো লাগবেই, কাক হয়ে কাকের মাংস খাওয়া ইত্যাদি। উঠে এসেছে কিছু লোকগালাগাল সংসারখাকি, সুখখাকি, ভাতারখাগি, রাখনী, এল্লোত ইত্যাদি। লোকআভরণ শাঁখা এবং লোকগৃহ স্থাপত্য কড়িবর্গার কথা। লোকযন্ত্র যেমন—মাছ ধরার আড়ি বাঁশ, গাবকষে ছাপান পাকা সুতোর জাল। এছাড়া চিরপরিচিত লোকসংস্কারও এখানে উপস্থিত। এক শালিক অপয়া। দেখলে দিন খারাপ যায়। দুঃসংবাদ আসে। যেমন নুনমাটি শুকিয়ে গেলে রাক্ষুসী নোনাখালের খিদে বাড়ে। তখন সে যা পায় তাই খায়। নোনাই জলে ডুবে যাওয়ায় একথাই মনে হয়েছে লবঙ্গের। অমাবস্যায় কুকুর কামড়ালে পেটের ছেলে পূর্ণিমা রাতে কুকুরের মত ডাকে। লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিলে সেই আগুনের তাপে বিষ নষ্ট হয়ে যায়। এই উপন্যাসটির শরীর জুড়ে এমনই সব লোক উপাদানের আলপনা এঁকে দিয়ে গেছেন অনিল ঘড়াই। গোটা আখ্যান জুড়ে নিম্নবর্গ মানুষের অর্থক্লিষ্ট জীবন, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই আর সেই জীবনকে ঘিরে নানা লোকায়ত যাপনচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

ঔপন্যাসিক নলিনী বেরা রচিত 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' (২০১৮) সেই তুলনায় অনেকটাই স্বতন্ত্র উপন্যাস। এ যেন লেখকের আত্মজীবনী। সাঁওতাল, ভুঁইয়া, ভূমিজ, লোধা, কামহার, কুমহার, মাহাতো, মাহালী, তাঁতি সবাই যেন লেখকের মানসপট ধরে হেঁটে গেছেন প্রারম্ভ থেকে সমাপ্তির দিকে। লেখকও যেন তাঁর সেই চিরপরিচিত গ্রামীণ স্মৃতির নীহারিকা পথ ধরে লিখে গেছেন অনর্গল। বার বার খেই হারিয়ে যাওয়া স্রোতে ফিরে ফিরে এসেছেন লোকচেতনার ঢেউয়ে ভেসে। ফলে এই উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির উপাদান অজস্র। কাহিনি আলেখ্যকে ছাপিয়ে গেছে এই উপাদানের বিস্তৃতি।

এই উপন্যাস থেকে প্রাপ্ত মেদিনীপুরে প্রচলিত কয়েকটি প্রবাদ হলো—১. 'কউ কথা কথাকু, 'না-আ' পেলি দেলি কলিকতাকু' অর্থাৎ অত কিসের কথা। নৌকা চলল কলকাতা। ২. 'এক শালিকের দুই মাথা, শালিক গেল কলকাতা।' ৩. 'বারো মাস জলে একশো দুশো গিলে।' ৪. 'লিখিবু পড়িবু মরিবু দুখে। মৎস্য মারিবু খাইবু সুখে।।' ৫. 'শুকনা কলসি শুকনা না, শুকনা ডালে ডাকে কা।/যদি দেখ মাকুন্দ ধোপা, এক পা না যাউ বাপা'। কারণ মাকুন্দ

ধোপার মুখ দেখে কোথাও গেলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। ৬. 'ব্যাপারে অপার সুখ, সব সুখ চাষে, চাকুরিয়া কুকুরিয়া ঘুরে দেশে দেশে।' ৭. 'আইলা বাভন মাইলা তালি। নিই পলাইলা চাউল থালি।' ৮. একটি তারা দুটি তারা কোন তারাটা আরাঝারা! এমন আরও অজস্র।

উপন্যাস থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি লোকশ্রুতির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। যেমন— ১. 'বাউটিয়া ভূত' বা রাস্তা ভূত বা যে ভূত রাস্তা ভুলিয়ে দেয়। সেই ভূতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র নিশানা 'বাজে শিমুল' গাছ। ২. সোনাধোয়া জল নিয়েই নদী নেমে আসে তাই নাম সুবর্ণরেখা। কিংবা নদীর উৎসভূমিতে ধলভূম গড়ে 'সোনাহাতু' নামে একটি গ্রাম আছে। সেই জন্যই নদীর নাম সুবর্ণরেখা। ৩. এখনও কোথাও আছে 'পাণ্ডরা' গ্রাম, যে গ্রামে কিছুদিন পাণ্ডবরা তাদের অজ্ঞাতবাস কাটিয়েছিল। ৪. এখনও আছে 'অসুরহুড়া' গ্রাম, যেখানে ভীম অসুর নিধন করে অজস্র হাড় জমা করেছিল। ৫. আছে 'ভাতহান্ডিয়া' গ্রাম, যেখানে রান্নার শেষে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে রাখতেন দ্রৌপদী। ৬. আর আছে 'পান্ডবেশ্বর' গ্রাম, যেখানে শিবের আরাধনা করতেন পান্ডবেরা ইত্যাদি।

'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' উপন্যাসে আছে অজস্র লোকগান, যাত্রাপালার গান। কখনও কোনও লোকউৎসব বা লোকমেলাকে কেন্দ্র করে, কখনও বা বিবাহাদির অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেও অগুন্তি ছড়া, গানের প্রকাশ ঘটেছে। গানের অনুষঙ্গে এসেছে বিচিত্র নামের সব লোকবাদ্যযন্ত্র। কোথাও কোথাও গানের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে লোকনৃত্য, লোকনাটক, লোকভঙ্গিমা। যেমন—১. বড়োডাঙা গ্রামে হাটুয়াদের আসর বসে। রাজু, সদগোপ, খণ্ডায়েৎ, কারণ ইত্যাদি জাতের মানুষ যারা বাংলা-ওড়িয়া মেলামিশি ভাষায় কথা বলে তাদের হাটুয়া বলে। সেখানে ঢোল বাজনার তালে চড়িয়া-চড়িয়ানির গানে নাটুয়ারা নাচে। 'কুহ কেঁহি দেখিয়াছ কি কনে গেলা মো চন্দ্রবদণী। মু গলি বিদেশরো বারো বরষো তু কা বুদ্ধিরে পড়ি গেলু ঘর ছাড়ি।' ২. বাছুরখোঁয়াড় গ্রামে বর্ষাকালের একটি প্রিয় লোকউৎসব নৌকাবিলাস। যেখানে নৌকাকে ফুল, চন্দন, তেল, সিঁদুর দিয়ে ঘটা করে সাজানো হয়। এরপর কীর্তনীয়ার দল কপালে তিলক, গলায় কাঠমালা, গায়ে সাদা গেঞ্জি, গলায় গামছা ও পরনে ধুতি পরিধান করে নৌকায় উঠে কীর্তনের নানা পর্যায়ের যেমন—মাথুর, মানভঞ্জন, বৈঠকী প্রভৃতি গান গায়। এই গানগুলির সঙ্গে ব্যবহৃত হয় তিনপ্রকার লোকবাদ্য। যেমন—খোল, কর্তাল ও গুপীযন্তর। এছাড়া মন্দিরা, মৃদঙ্গ। ৩. 'কেঁদরা' এটি বেহালা জাতীয় একধরনের বাদ্যযন্ত্র। ৪. গ্রামের দুটি ঝর্ণার একটি সাঁওতালদের। সেই ঝর্ণা থেকে খেক্রে মাই, ঢালো, কাঁদ্রিরা স্নান সেরে টুসুগীত গাইতে গাইতে বাড়ি ফেরে। 'জলে জলে যাইও টুসু জলে তোমার কে আছে। মা-বাপ ছাড়া সবাই আছে গো জলে শ্বশুরঘর আছে।' ৫. আরও একটি টুসু গীত 'তোদের টুসুর চোখদুটি পেঁইয়াজ-ভাজা। তোরা যতই সাজা।' ৬. সাঁওতালদের গান সেরেঞ। বাহা পরবের 'বাহা' আসা উপলক্ষ্যে তারা গায় 'নায়কে মায় উম রাকাপ এন লদী ঘাটিরেনায়কে এরায় বহেল রাকাপ সীতানালারে'। ৭. 'মহড়া নাচ' যেটি মুখোশ পরে নাচা হয়। এটি 'ফরিখেল' বা লাঠিখেলার মাধ্যমে নাচা হয়। ৮. নাচনীরা গাইতে গাইতে নেচেছে 'আমার যৌবনকালে বিনা তেলে রূপ জ্বলে।/মরি তাই ত ভাবি মনে মনে আমার নবযৌবন গেল অকারণে।' ৯. এমনকি আছে কাঁদনা গীত'নদী সেপারে কি বাজিলা তুরী। ঝিঅ গলা

গলি আইলা হুরি' ইত্যাদি।

পারিবারিক বিবাহ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গান ও ছড়ার বিচিত্র সমাহারও এককথায় অনবদ্য। যেমন মাকে নিয়ে ছড়া—'বর-বরিয়াতি ছাগল আঁতি। বরের মাকে লে'গল তাঁতি॥' কয়েকটি গানও এমনই বিনোদনের। 'বেহা বেহা করি আমাদের কবে হবে বেহা গো। কইন্যার মামা ঘরে না পাইল গুয়া-পান গো।' একটা আবার এরকম 'বরের মাকে বলশহর 'ঝাঁটিয়াতে'। সাধের বউ আসবেক নগর 'বুলতে'।' আবার কনেকে নিয়ে গান 'তোকে যে লো দেখেছিলি ছাগলবাগালী।/ছাগল-টাগল খেদাঁয় দিয়ে কইন্যা হয়ে আইলি।' কখনওবা বৃদ্ধরা বরকে উদ্দেশ্য করে গেয়ে উঠেছে 'পূবে না যাইও পশ্চিমে না যাইও না যাইও মালংগা দেশে।/ মালংগা দেশে রাজা ডাহিনী-যুগিনী রে কোনডাইন রাখিবে ভুলায়ে।' আরও অগুন্তি।

উপন্যাস জুড়ে ছড়িয়ে আছে অজস্র কিংবদন্তি—১. 'জাহাজকানার জঙ্গল' কথিত আছে সুবর্ণরেখার নদীগর্ভের এই এলাকায় মালমশলা বোঝাই একটা আস্ত জাহাজ ডুবে গেছিল। সেই জাহাজই নাকি বালিপোত থেকে মাটিপোত হয়ে বর্তমানে জাহাজকানার জঙ্গল। ২. সুবর্ণরেখা নদীটি সম্পর্কে একটি কিংবদন্তি কথককে বলেছে খান্দারপাড়ার ঝড়েশ্বর পানী—"সোউ যে বেহারাঘর দেখুটু ললিন, বেহারাবুড়ার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা তার ঠাকুর্দার তার ঠাকুর্দা পুত্র কামনায় নদীজলে সোনার থালা ভাসাই থিলা বলি না নদীর নাম হেলা সুবর্ণরেখা!"[৭] ৩. কোনও এককালে হাতি বাঁধা থাকত। তাই গ্রামের নাম হাতিবান্ধি বা হাতিবাঁধি। কথিত আছে একসময় এই গ্রামের গড়টি ছিল দুর্ধর্ষ মারাঠা দস্যু ভাস্কর পন্ডিতের, যা নিয়ে বহুকাল আগে থেকে চলে আসছে ছেলেভুলানো ছড়া 'ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো বর্গী এল দেশে। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে।' এই গড়ের নৈঋত কোণে অবস্থিত ভৈরবেশ্বর মন্দির সংস্কার করতে গিয়ে পাওয়া যায় সারি সারি অজস্র রক্তবীজের মতো ডেঙো পিঁপড়ে। অগণিত পিঁপড়ের উৎপাতে সংস্কারের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এই পিঁপড়ের হঠাৎ আগমনে গ্রামবাসীরা মনে করেছিল—"পিঁপড়ে কি আর, ওসব বর্গীর দল, মরে ভূত না হয়ে হয়েছে পিঁপড়ে।"[৮]

এছাড়া আছে অজস্র লোকখাদ্য। তার কয়েকটি উল্লেখ করা যাক—১. শাকমুথা, ঘল্‌ঘসি, সরন্তি, শুশনি, ঘোড়াকানা, নাহাঙ্গা, বনপুঁই, বনকাল্লা, চ্যাঁকা। ২. ফলকাঁকড়ো-কুঁদরি-ভেলা, ভুড়রু-কেঁদ-কষা। মেহা-মাদাল (আতা)। ৩. আলুজাতীয় আঁউলা-বাঁউলা-পানআলু, খামআলু। ৪. মূল-চুন, চুরকা। ৫. বাঁশকরোল বা বাঁশপোঙড়া। এটি সেদ্ধ করে মাংসের মশলা দিয়ে রান্না করে তরকারি হিসাবে খায়। ৬. গোবর গাদার ভেতর থেকে ভুস ভুস করে বেরিয়ে আসা পেটমোটা ও ডানাওয়ালা লাল পিঁপড়ে বা শালুইপোকা। এটি বালির খোলায় ভেজে চালভাজার সঙ্গে খায়। ৭. 'বাসিয়াম' অর্থাৎ বাসিভাত। ইত্যাদি।

লোকপ্রযুক্তি, লোকযন্ত্র, লোকপেশার অবিশ্বাস্য সম্ভার এই উপন্যাসে বর্তমান। লোকযন্ত্র বা প্রযুক্তির মধ্যে যেমন আছে মাছ ধরবার নানা প্রকার জাল পাটা, ঘুনি, গাঁতি, মাথাফাবড়ি, চারগোড়িয়া। নৌকা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় 'গজাল' বা লম্বা বাঁশ। নৌকার মিস্ত্রিদের ব্যবহৃত লোকযন্ত্রগুলি হলো 'তুরপুন', 'কুর্ষুৎ', 'ভ্রমর', 'বাটালি', 'করাত', 'হাতুড়ি' এবং 'বাগা'। 'বাগা' যন্ত্রটি কাঠের তক্তা বাঁকানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। গোবর মাখিয়ে খড় বা কাঠের

ভুষির আগুনেও তক্তা বাঁকানো হয়। নলিনী বেরার 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' উপন্যাসটি গ্রাম বাংলার যাবতীয় লোক উপাদানে ভরপুর। কী নেই সেখানে! ঝাড়ফুঁক-তন্ত্রমন্ত্র-তাবিজ-কবচ। মন্ত্র-ছড়া-ধাঁধা-হেঁয়ালি-কিংবদন্তি। লোকসঙ্গীত-লোকনৃত্য এমনকি প্রবাদ-প্রবচন- লোকশিল্প-লোকযানবাহন-লোকখাদ্য-লোকপানীয়-লোকনেশা-লোকআসবাবপত্র-লোকযন্ত্র-লোকঅস্ত্র-লোকপরিচ্ছদ-লোকআভরণ-লোকতৈজস-লোকবাদ্য-গৃহস্থাপত্য-লোকচিকিৎসা-ঔষধ-লোকাচার-লোকউৎসব-লোকমেলা আরও কত কি। আর সে আলোচনাও বিপুল। তারই খানিকটা রূপরেখা তুলে ধরা গেল মাত্র।

অভিজিৎ সেন, অনিল ঘড়াই ও নলিনী বেরা এই তিন ঔপন্যাসিকই অন্ত্যজ জীবনের কথাকার। কিন্তু তিন ঔপন্যাসিকের উপলব্ধিতে বেশ কিছুটা ফারাক আছে। অভিজিৎ সেন কর্মসূত্রে অন্ত্যজ মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন, অনুভব করেছেন তাদের সংকট। তাই তাঁর উপন্যাসে সম্পর্কের সংকট বড়ো প্রবল। সেই মুখ্য টানাপোড়েনের সূত্র ধরে ভিড় করে এসেছে লোক উপাদান। অনিল ঘড়াই-এর রচনায় নিম্নবর্গীয় মানুষের পরিবর্তনশীল জীবনধারার একটি বিশেষ রূপ অঙ্কিত। এখানে সভ্য সমাজের সঙ্গে এসে মিশেছে লোকসমাজ। এ সমাজে মানুষের মন থেকে মুছে যাচ্ছে যাবতীয় চিরাচরিত লোকপ্রথার প্রতি অন্ধবিশ্বাস। মেয়েরা হয়ে উঠতে চাইছে স্বাবলম্বী। আত্ম-স্বাতন্ত্র্যে, নিজস্ব চিন্তা-চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা এগিয়ে যাচ্ছে বিবর্তনের পথ ধরে। বেছে নিচ্ছে নিজের পেশা। পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যেতে তারা আজ বদ্ধ পরিকর। অপরদিকে বাছুরখোঁয়াড় গ্রামে শৈশবকাল থেকে বেড়ে ওঠা নলিনী বেরা কর্মসূত্রে চূড়ান্ত নাগরিক। অথচ তাঁর স্মৃতিতে শয়নে স্বপনে জ্বল জ্বল করে ছেলেবেলা। তাই তাঁর উপন্যাস অতীত ও বর্তমানের মেলবন্ধন। যে মানুষ বারবার হারিয়ে যেতে চায় তার ফেলে আসা অতীতে। অনুভবে যাঁর মনন আজও ফিরে ফিরে দেখে গ্রামীণ সেই নানা রঙের দিনগুলি। তিনি সেই লোকসমাজেরই একান্ত নিজের লোক। তাই তাঁর উপন্যাসে ভাষার পারিপাট্য নেই, কাহিনির একমুখী গতি নেই, আছে কিছু ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পুঞ্জীভূত জীবনের সুবর্ণ রেখার টান। এভাবেই ত্রয়ী ঔপন্যাসিক তাঁদের জীবনের স্বকীয় আলোকমালায় উদ্ভাসিত করে তুলেছেন নিজ নিজ উপন্যাসের অন্তঃপ্রকোষ্ঠ। এখানেই ঔপন্যাসিক ত্রয় স্বতন্ত্র।

উৎসের সন্ধানে

১. অভিজিৎ সেন : 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫, পৃ. ২৯
২. তদেব : পৃ. ৯৬
৩. অনিল ঘড়াই : 'নুনবাড়ি', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৬, পৃ. ২৭
৪. তদেব : পৃ. ৫২
৫. তদেব : পৃ. ৮২
৬. তদেব : পৃ. ৯৩
৭. নলিনী বেরা : 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৮, পৃ. ২৯
৮. তদেব : পৃ. ৮১